যুগান্তর

তারিখ 17 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাইমারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাইমারি জ্ঞান আছে তো?

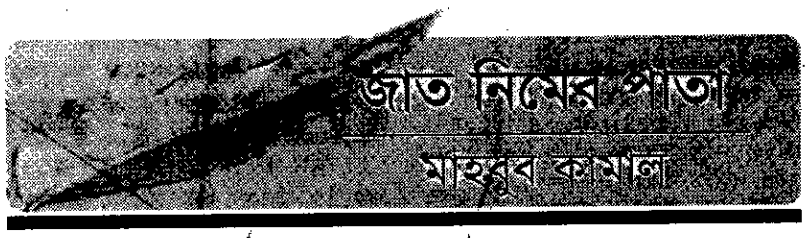

গত একটা লেখায় শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে দু-একটা সুইপিং মন্তব্য করেছিলাম আর তাতেই এক পাঠক ভেবে বসলেন শিক্ষা বিষয়টিতে আমি না জানি কত কিছু জানি বা বুঝি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কিছু লিখতে বলেছেন তাই। এসিডিটি থাকলেও অনুরোধে ভাজাপোড়া খেতে হয় কখনও কখনও; কিন্তু সুস্থ শরীরেও অনুরোধে ঢেঁকি গেলা কি সম্ভব? কোনোকিছু নিয়ে লিখতে হলে লেখককে প্রথমেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়: বিষয়টিতে তিনি অথরিটি কিনা। জামিলুর রেজা চৌধুরী কিংবা মুহম্মদ জাফর ইকবাল এ ক্ষেত্রে এত বড় অথরিটি যে, শিক্ষাব্যবস্থার গতিপথটা তারা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখাতে পারেন না শুধু, সেই পথ ধরতে কমান্ড করারও যোগ্যতা রাখেন। আলোচ্য পাঠক আমার অনায়াসের সম্পদ, তারপরও তাকে উপেক্ষা করতাম; কিন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখলাম এ বিষয়ে লেখার কিছু না কিছু যোগ্যতা আছে আমার। শহর ও গ্রাম— দুই জনপদেই শিক্ষকতা করেছি আমি। দ্বিতীয় কথা, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলা সদরে তাহেরা বিদ্যাপীঠ নামের যে স্কুলটি আমরা কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম '৯০ সালে, সেখানে সাড়ে তিন বছর ছিলাম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের দায়িত্বে। এ স্কুলে ড্রপআউট নামের কোনো পদার্থ নেই এবং প্রথম ৩-৪ বছর এলিমেন্টারি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল যারা, তাদের প্রায় সবাই এখন দেশে-বিদেশে করে খাচ্ছে না শুধু, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করছে। স্কুল ও বৃহৎ কারখানা— যদি ড্রপআউট না থাকে, বুঝতে হবে স্কুলটিতে পড়াশোনা এবং কারখানাটিতে কাজের পরিবেশ ও রিটার্ন ভালো এবং প্রথমটির ক্ষেত্রে অভিভাবকরা ও পরেরটির ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট রয়েছে।

সুতরাং শুরু করা যাক। তবে শিক্ষার সব স্তরই তো আর এক কলামে আটবে না। প্রাইমারিই আমাদের টার্গেট আজ।

১. প্রথমে একটা ছোট্ট গল্প বলি। এক স্কুলে ইন্সপেক্টর এসেছেন। এই যে, কথা বলতে গেলেই সাইড-টক এসে যায়। স্কুল পরিদর্শনে ইন্সপেক্টর আসেন যখন, ছাত্রছাত্রীরা ভাবে তিনি পয়গম্বরের কাছাকাছি কেউ। এত ছোটতেই এমন মহানের দেখা পেয়েছে তারা যে, জীবনটা ওখানেই শেষ হয়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না। মহতের 'অগাস্ট ভিজিট' উপলক্ষে ছুটির দরখাস্ত করতাম আমরা। হেডস্যার তা মঞ্জুরও করতেন। এত খুশি, বুঝতেই পারতাম না, আর ওই বয়সে বুঝবই বা কী করে যে, হেডস্যার শুধু আমাদের জন্য ছুটিই মঞ্জুর করেননি, ওই রহস্যময় মহান পুরুষের জন্য পজিটিভ রিপোর্টের আশায় ঘুষ হিসেবে মঞ্জুর করেছেন একটি প্যাকেট, তাতে রয়েছে টাকা। অবশ্য টাকা কী জিনিস, সেটাই তো বুঝতাম না, বুঝতাম দ্রব্য। বাবা প্যান্ট কিনে দিয়েছেন, ব্যস, এর ক্রয়-প্রক্রিয়া আবার কী! টাকা যে কী, এখন বুঝি। পৃথিবীর সব শিশুই সরল, হিটলারও তা-ই ছিলেন। শিশু পরিবেশ বোঝে না, তাই তার হাসি নির্মল, সৌন্দর্যমণ্ডিত; পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার সেই হাসি ধীরে ধীরে সাদামাটা হয়, কখনও বা হয়ে ওঠে ক্রুর। বয়স বাড়লেও যারা সুন্দর হাসি অক্ষুণ্ন রাখে, বুঝতে হবে তারা পরিবেশকে কেয়ার করে না মোটেও।

তো ইন্সপেক্টর ক্লাস ফাইভে ঢুকে ফার্স্ট বয়কে দাঁড়াতে বললেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো বৃষ্টি কেন হয়? ছেলেটি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, স্যার এখনকার বৃষ্টি, না এক ঘণ্টা পরের বৃষ্টি? এই অদ্ভুত প্রশ্নে বিস্মিত গলায় ইন্সপেক্টর যখন বললেন, ধরো এখনকার বৃষ্টি— ছেলেটি বলতে থাকল, তাহলে স্যার সমুদ্রের পানি সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে, সেই বাষ্প শীতল হয়ে ধীরে ধীরে পানির আকারে নিচে নামে অর্থাৎ বৃষ্টি হয়। ইন্সপেক্টরের পরবর্তী অনিবার্য প্রশ্ন, আর এক ঘণ্টা পরের বৃষ্টি? উত্তর, সেটা হয় স্যার হযরত মিকাইল আলায়হিস সালামের আদেশে। ইন্সপেক্টর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বললেন, বুঝিয়ে বলো। সে বোঝালো, বুঝলেন না স্যার! এখন আমাদের বিজ্ঞান ক্লাস চলছে, এক ঘণ্টা পরে হবে ধর্ম ক্লাস।

হ্যাঁ, এই বিভ্রান্তি দিয়েই শুরু আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন। ধর্ম ও বিজ্ঞান কোনোটাকেই তো অস্বীকার করা চলে না, তাহলে সে কীভাবে কাটাবে তার বিভ্রান্তি? আমি এই ক্লাসে থাকতে যেমন-তেমন একটা যুক্তি তৈরি করে স্থির হয়েছিলাম। সেটা হল, আদেশটা দিচ্ছেন হযরত মিকাইল (আ.), সেই আদেশ পাওয়ার পর সূর্য ও সমুদ্রের পানি অ্যাক্ট করা শুরু করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীসহ দেশের সব শিক্ষাবিদকে একটি প্রশ্ন করতেই হবে— জ্ঞানের যে কোনো শাখারই একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে; কিন্তু অংকসহ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের একটি প্রশ্নের দুই রকম উত্তর হয় কী করে? আমরা কি শিশুদের যুক্তিবোধ নিয়ে খেলায় মেতেছি? আরেকটি প্রশ্ন— মাদ্রাসা তো বটেই, সবক্ষেত্রেই আমরা শিশুদের এমন ধর্মশিক্ষা কেন দিচ্ছি, যা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করে? তাহেরা বিদ্যাপীঠে আমরা যখন কারিকুলাম তৈরি করছিলাম, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, ইসলাম ধর্ম নামে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না। সাবজেক্টের নাম হবে তুলনামূলক ধর্ম। ছাত্রছাত্রীরা সব ধর্ম সম্পর্কেই ধারণা নেবে, অতঃপর নিজেরাই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার করবে। তাকে আমি জোর করে কিছু গেলাব কেন? সে কি জ্বরে ভুগছে যে, ট্যাবলেটটা জবরদস্তি ঠাসতে হবে?

২.

নব্বই দশকের গোড়ার দিকে ইউনিসেফ

বাংলাদেশসহ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার ১৪টি দেশে শিশুদের নিয়ে জরিপ করেছিল। কী পাওয়া গেছে শুনবেন? বাংলাদেশের প্রাইমারি ছাত্রছাত্রীদের গড় মেরিট লেভেল বাকি ১৩টির সমান বয়সীদের চেয়ে উঁচুতে। তারপরও ওই ১৩টি দেশের ছাত্রছাত্রীরা যেখানে তিন থেকে পাঁচটি ভাষা শেখে, সেখানে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষাটাও ঠিকমতো শিখতে পারে না। এক ডাচকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের তো ইংরেজি আর ডাচ শিখলেই হয়, এত ভাষা শেখো কেন? বলেছিল, এমনিতেই ছোট্ট দেশ, উপরন্তু সাগরতল, ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে হয়। অন্যের ভাষা না শিখলে তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করব কীভাবে?

তো ইউনিসেফের জরিপ দল বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের এই পিছিয়ে পড়ার তিনটি মূল কারণ চিহ্নিত করেছিল। এক নম্বরটা ছিল, ছাত্র ও শিক্ষকের বিসদৃশ অনুপাত। প্রাইমারির ক্লাসে একজন শিক্ষক এত অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করেন যে, ফলাফলকে এক কথায় বলা যায়— মাচ অ্যাডো ফর নাথিং। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকের থাকে না rapport অর্থাৎ যোগাযোগ, শ্রেণীকক্ষে বিরাজ করে apathy, এক ধরনের ঔদাস্য। ফলে নিচুদের টেনে তোলা দূরের কথা, উঁচুদেরও কোনো কাজে আসেন না শিক্ষক।

জরিপে পাওয়া দ্বিতীয় কারণটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ সেটা পরীক্ষা পদ্ধতি। বলা বাহুল্য, পরীক্ষা ও পাঠদান পদ্ধতি সমানুপাতিক হতে বাধ্য। পরীক্ষা পদ্ধতিই ঠিক করে দেয় পাঠ্যসূচি কী হবে এবং তা কীভাবে পড়াতে হবে। আমাদের যে পদ্ধতি, তাতে লক্ষ্য থাকে কে কত পণ্ডিত। আর তাই মানবশিশুর রূপান্তর ঘটিয়েছি আমরা পিঁপড়ায়, শরীরের চেয়ে ভারি খাদ্যকণা মুখে নিয়ে যে পিলপিল পায়ে হেঁটে যায় স্কুলের দিকে। অথচ প্রাইমারিতে literacy (পড়া ও লেখার ক্ষমতা) ও numeracy (সংখ্যা অথবা একটু বেশি অংকজ্ঞান) শেখানোই যথেষ্ট। বিরাজমান পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি করেছে এক অস্বাভাবিক ফ্যাশনসর্বস্ব প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। তার সন্তানকে ব্রাকেটবন্দি করতে হব জিপিএ ৫-এ। অথচ পুকুরের সাঁতার প্রতিযোগিতার কী এমন তাৎপর্য! বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল যে, সে ফার্স্ট হয়ে গেল, এক সেকেন্ড দেরি করল যে, সে পারল না। এই অভিভাবক নদী বা সমুদ্রের প্রতিযোগিতার জন্য তার সন্তানকে প্রস্তুত করতে রাজি নন। সে অনেক দীর্ঘ অপেক্ষা, কে সইতে যায়। তাই ছোটখাটো অমর্ত্য সেন হওয়ার কথা ছিল যার, ওই অপেক্ষাটা করেননি বলে সন্তান হয়ে গেল স্টেরিওটাইপ।

এ প্রসঙ্গে একজন অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু দেখুন, অবশ্য এই ভঙ্গির জন্ম দিয়েছে খোদ পরীক্ষা পদ্ধতিই। মা তার প্রতিবেশীকে বলছেন, আমার ছেলেটা অংকে দারুণ। ৮০ পেয়েছে, হাইয়েস্ট। তবে কী যে করি, ইংরেজিতে একদম কাঁচা। প্রতিবেশী বললেন, কত পেয়েছে? উত্তর, আর বলবেন না, ৯০, আরও বেশি পেত, সেদিন যা জ্বর, কোনোরকমে পরীক্ষা হলে গেছে। প্রতিবেশী বিস্মিত হয়ে বললেন, তো কাঁচা বলছেন কেন? গরবিনীর গরব নেই মুখে, বললেন, সেকেন্ড হাইয়েস্ট পেলে আর কী বলব?

ইউনিসেফ তৃতীয় কারণটি বলেছিল, প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা। এটা নিয়ে আমরা কথা বলব না। হাসিনা-খালেদার এরিয়ায় ঢোকার কোনো এখতিয়ার নেই আমাদের।

৩.

ব্যাপারটা অদ্ভুত না, রবীন্দ্রনাথের জন্মসাল ১৮৬১ না লিখে যদি ১৮৬২ লিখি, তাহলে শূন্য পেয়ে গেলাম, অর্থাৎ আমি কিছুই জানি না! প্রাইমারি শিক্ষকদের বলি, ওই বয়সে ছাত্রছাত্রীদের পণ্ডিত কিংবা তথ্য-ব্যাংক— কিছুই বানানোর দরকার নেই। ভাষা ও অংক শেখানোর পর যেটুকু সময় থাকবে, গল্পচ্ছলে তাদের একটা সিনথেটিক মাইন্ড গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। বাকিটা একসময় ওরা নিজেরাই করে নেবে। লক্ষ করুন, বলেছি সিনথেটিক মাইন্ড, অ্যানালিটিক্যাল নয়। অ্যানালিসিস মানে কোনো কিছুকে টুকরো টুকরো করে দেখা আর সিনথেসিস হচ্ছে সেই টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। গল্পগুলো করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ওই বয়সে কতটা কনজিউম করার ক্ষমতা রাখে তারা।

সৃজনশীল পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের কী সৃজন করে চলেছে, সচিবালয়ে যাওয়ার সময় পাচ্ছি না বলে প্রশ্নটা নাহিদ ভাইকে জিজ্ঞেস করতে পারছি না। এককালে কমিউনিস্ট ছিলাম দুজনই। অসংখ্য মানুষের এত যে ডেডিকেশন, মার্কসবাদ শেখার অহোরাত্রি চেষ্টা, বিপ্লবটা করতে পারলাম না কেন? মার্কসীয় সূত্র দিয়ে কতভাবেই না ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি সমাজ, পেরেছি কি সত্যি সত্যি ব্যাখ্যা করতে? পারিনি। শেখায় গলদ ছিল যে! যুক্তিহীনতা ও অপযুক্তির এই দেশে সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক ক'জন আছে, সেটাও আরেক প্রশ্ন। প্রাইমারিতে সৃজনশীল পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র এবং ছাত্রছাত্রীদের নাকি ২৯টি বিষয়ে যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়! এত যোগ্যতা দিয়ে তারা কী করবে অথবা যোগ্য বানানোর কারিগররা নিজেরাই কি যোগ্য? যোগ্য শিক্ষকের প্রসঙ্গ এলে পাটগ্রামের কিছু স্মৃতি মনে আসে। উচ্চশিক্ষার শিক্ষকের কথা। কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্প্রতি প্রয়াত অধ্যাপক, জানতেন না সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন! আরেকদিন আমাকেই বলেছিলেন— না, না এটা তো ভিপি সিং বলেননি, বলেছেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। তাকে বোঝাতে হয়েছিল বিশ্বনাথ প্রতাপই সংক্ষেপে ভিপি। বাংলার এক অধ্যাপক পড়বি পড় মালির ঘাড়ে, আমাকেই বললেন— বঙ্কিম তো রবীন্দ্র অনুসারী ছিলেন...! বাংলার শিক্ষকদের কাছে 'রবীন্দ্র অনুসারী' পদযুগলটি খুব প্রিয়। এটা যত্রতত্র ব্যবহার করে স্মার্টও থাকা যায়। নাহিদ ভাই কি এসব তথ্য চেক-ক্রসচেক করেন?

৪.

এ দেশে কোন্ খাতে কত বিনিয়োগ বা খরচ করলে কী ফেরত আসবে— এই কস্টিংটা করা হয় কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহ নিয়েই বলতে হয়, প্রাইমারি শিক্ষাখাতে যে বিনিয়োগ করছি, তার কস্ট ইফেকটিভ বের করা হয়েছে কি? একজন ছাত্রের পেছনে যে খরচটা হচ্ছে, লেখাপড়া শিখে সে সোসাইটিকে যা দিচ্ছে, তার মূল্যমান ও সেই বিনিয়োগের অনুপাত কত? কবিতাটা হুবহু মনে নেই, অনেকটা এমন— ছেড়ে চলে যাবে বলেই ছিল ভালোবাসার এত আয়োজন! প্রাইমারি শিক্ষাখাতে কত যে আয়োজন, ফলাফল কী? ড্রপআউট বাদই দিলাম, লেভেলটা শেষ করে উচ্চতর লেভেলের জন্য যোগ্য হয়ে উঠছে ক'জন?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন, যার পোটেনশিয়াল অর্থাৎ অব্যক্ত- অস্ফুট-প্রচ্ছন্ন-সুপ্ত ক্ষমতা যা, সে অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে কি? অথবা তার ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত তাকে সেভাবেই তা দেখানো হচ্ছে কিনা। তোমার জীবনের লক্ষ্য— এই রচনায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হব এই লক্ষ্য লেখা বন্ধ করতে হবে এ দেশে। বৈচিত্র্যহীন, হুজুগে, একরৈখিক এই শিক্ষাপদ্ধতির অবসান হওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে আমাদের।

পুনশ্চ : লেখাটা পড়তে পড়তে যারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তাদের রিফ্রেশ করতে একটা গল্প বলি। ক্লাস টেনের এক ছাত্র এক মিষ্টির দোকানে গিয়ে বলল— আমাকে এক কেজি রসগোল্লা দিন। দোকানকর্মী মাপতে যাবে, তখন সে বলল, না না আমাকে বরং এক কেজি জিলাপি দিন। জিলাপি মাপার সময় সে এবার বলল, থাক থাক আমাকে এক কেজি শুকনো মিষ্টি দিন। মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে সে দাম না দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। দোকানি বললেন— টাকা? কীসের টাকা? ক্ষেপে গেল ছাত্রটি। দোকানি বললেন, মিষ্টির টাকা। ছাত্রটি বলল, মিষ্টি তো জিলাপির পরিবর্তে নিলাম। দোকানির কথা, তাহলে জিলাপির দাম দাও। এবারের উত্তর, জিলাপি তো নিয়েছি রসগোল্লার বদলে। দোকানি যখন বলল, তাহলে সেটারই দাম দাও, ছাত্র বলে উঠল— আরে রসগোল্লা আমি কোথায় নিলাম!

পাঠক বলুন তো, শিক্ষক তাকে ভবিষ্যতে কী হওয়ার দীক্ষা দেবেন? পারলেন না? পলিটিশিয়ান!

মাহবুব কামাল : *সাংবাদিক*
mahbubkamal08@yahoo.com